

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

আজহারউদ্দীন খান

নজরুল ইসলামের প্রিয় কবি ছিলেন দুজন-এক রবীন্দ্রনাথ অন্যজন হাফিজ। হাফিজের দীওয়ানের অনুবাদ দিয়ে তাঁর কবি জীবনের সূত্রপাত না হলেও করাচীর সেনানিবাসে তিনি মৌলবীর কণ্ঠে হাফিজের দীওয়ান আবৃত্তি শুনে ফারসী ভাষা আয়ত্ত্ব করে সমগ্র দীওয়ান পড়েছিলেন এবং কিছু কিছু রুবাই-এর অনুবাদ সেনানিবাসে বসেই করেছিলেন; সেগুলি পরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আরও পরে পুত্র বুলবুলের মৃত্যুশোক ভোলার জন্য হাফিজের রুবাই অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং গ্রন্থাকারে ১৯৩০ জুলাইতে বেরোয়। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে যখনি কবিতা তব পড়িয়াছি আমি, তার আশ্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়'-এ তাঁরই স্বীকারোক্তি (দ্রঃ অশ্রু পুষ্পাঞ্জলিঃ নতুন চাঁদ)। তিনি তাঁর কবিতা স্কুল জীবনে বহু জায়গায় আবৃত্তি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কেউ কিছু বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি রুষ্ট হতেন। সিয়ারসোল রাজস্কুলে পড়ার সময়  রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করেছিল একজন, বলেছিল তিনি বড়লোকের ছেলে, টাকার জোরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কবিতা তেমন উচুদরের নয়, টাকা থাকলে ওরকম কবিতা সবাই লিখতে পারে। এই বলায় নজরুল ত্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং বাঁশের লাঠি দিয়ে তার মাথায় জোরে এক ঘা বসিয়ে দেন। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। ছেলেটির আত্মীয় স্বজন নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। মামলা আদালতে ওঠার আগে আপসে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। হুগলিতে নজরুল যখন সপরিবারে বসবাস করছেন সেইসময় তাঁর বন্ধুটি তাঁকে মাথায় মারার চিহ্নটি দেখিয়েছিলেন। নজরুল এই ঘটনাটি পরে 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত (১৯২৭ সালের ২য় বর্ষ ৩৭ সংখ্যাঃ ১৩৩৪ ১৪ই পৌষ) 'বড় পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, "আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজ্ঞা অক্ষয় হয়ে লেখা আছে এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাবিকরণের ওপরেই পড়েছিল।" সৈনিক জীবনেও সেনানিবাসে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপির বই 'স্বরবিতান' থাকত, রবীন্দ্রনাথের গানই তিনি গাইতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেও আড্ডায় মজলিসে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা সাক্ষাৎ শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে আর এই দেখা সাক্ষাতের মেয়াদ ১৯৪১ পর্যন্ত। এই কুড়ি বছরে অনেকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছে কিন্তু সমস্যা দাঁড়াচ্ছে প্রথম কবে কোথায় এবং কতবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য সঠিক দিনক্ষণসহ বিবরণ নেই। তবে বিভিন্ন জনের স্মৃতিচিত্রণ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ে রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী' মিলিয়ে দেখা সাক্ষাতের একটা হিসেব নিকেশ করা যেতে পারে।

সাহিত্যিকী

প্রথম সাক্ষাৎ কখন এবং কোন্ তারিখে হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না তবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্র ‘চলমান জীবন’কে অবলম্বন কালে প্রথম সাক্ষাৎকারের কিছুটা হৃদিশ মিলতে পারে তবে নির্দিষ্ট মাস তারিখ বলা সম্ভব নয় কারণ তেমন কাগজপত্র হাতে নেই। ১৯২০-২১ সালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন যেমন তীব্র হয়েছে তেমনি হিন্দু মুসলমান সমস্যাও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে নজরুল এলেন কলকাতায়, ১৯২০ সালের ষাট মাসে বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেবার পর। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলাদেশের বাইরে গুজরাটে। ১৯২০, ৩রা মে গুজরাট থেকে কলকাতায় ফিরেই বিলেতের পথে রওয়ানা হন, ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে সরাসরি বোলপুরে ফেরেন ১৬ই জুলাই ১৯২১ সালে। এবারে নজরুল কলকাতায় এসেই পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হলেন, তাঁর লেখাপত্র ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা’ ‘প্রবাসী’ ‘ভারতী’ ‘মোসলেম ভারত’ প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় বেরুতে থাকে। ফজলুল হকের ‘নবযুগ’ নামক দৈনিক সাক্ষ্য সংবাদপত্র মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে সম্পাদনার দায়িত্ব তখন নিয়েছেন। কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় যাতায়াতও শুরু করেছেন। গাজেন দার আড্ডায় সত্যেন দত্তের কাছে নজরুল নিজের কবিতা সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনে খুশি হন। ‘চলমান জীবন’ দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬১) পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই কথা বলেছেন, “সত্যি বলতে কি” বললেন সত্যেন জয়, গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছি কিনা। তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি-সমন্বেষের সাধনায় এই এক নতুন অবদান আনছে তুমি।” (পৃঃ ২৮৯) সত্যেন দত্তের কথায় উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য নজরুল অবীর হয়ে উঠেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন কাজে একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে তিনি নজরুল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মারফৎ ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকা দেখতেন। এই পত্রিকায় সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কবিতা বেরুতো, নজরুলেও কবিতা বেরুতো। ‘মোসলোম ভারতে’ নজরুলের কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুল সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। পবিত্র বাবু নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে যান। কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি। নজরুল রবীন্দ্রনাথকে দেখে অভিভূত হন যেমন গ্যেটেকে দেখে নেপোলিয়ান হয়েছিলেন। বিস্ময়ের ঘোরে তিনি কোন কথাই বলতে পারেন নি। এই সাক্ষাৎকার ঠিক কোন্ তারিখে হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না তবে এই সাক্ষাৎকার ১৯২০ মার্চ থেকে ১৯২১ ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে হয়নি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় বিদেশে ছিলেন আর নজরুলও নার্মিসের সঙ্গে বিবাহপর্ব চুকিয়ে ভগ্নহৃদয়ে ২৬শে জুলাই কুমিল্লা থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং দেশের হাল হকিকৎ জানতে কলকাতায় দিন কয়েকের জন্য এসেছিলেন (২০শে জুলাই ১৯২১) তারপর কলকাতায় তাঁকে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ১১ই আগস্টে পুনরায় আসতে হয়। ১৫ই

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

আগষ্ট ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ‘শিক্ষার মিলন’ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ২০ ও ২১শে আগষ্ট যথাক্রমে ‘সেবা সমিতি’ ও ‘সঙ্গীত সংঘ’ কবিকে সংবর্ধনা দেন। কলকাতায় অনুষ্ঠানাদি সেরে তিনি শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য ফিরে যান। ঐ মাসের শেষের দিকে তাঁকে আবার আসতে হয়। ‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শিক্ষার বিরোধ’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (নারায়ণ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮)। এই প্রতিবাদের লিখিত জবাব ‘সত্যের আহবান’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ২৯শে আগষ্ট পাঠ করেন। ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো বাড়িতে শান্তিনিকেতনের জল নিয়ে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান করেন। রবীন্দ্রনাথের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এই সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে নিজের পাশে বসিয়েছিলেন বলে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার ম্যানেজার শান্তিপদ সিংহ তাঁর ‘নজরুল কথা’ (১৩৭৯) স্মৃতিস্মরণে উল্লেখ করেছেন। পাশে বসানো নিয়ে সেদিন সভাস্থলে যে গুঞ্জন উঠেছিল তাও তিনি স্মৃতিচিত্রণে বলেছেন, “সভারস্তরের একটু আগে কবি নজরুল এসে ঢুকলেন একেবারে মঞ্চের ওপরেই। কবিগুরু পদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তিনি তাঁকে পাশের আসনে বসবার ইঙ্গিত করলেন। নজরুল আসন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রথম ও দ্বিতীয় সারির কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ গুনগুনিয়ে উঠলেন। তাঁদের মতে এবং কথায় রবীন্দ্রনাথের পাশে বসবার যোগ্যতা নজরুল ইসলামের নেই। একজন বিশিষ্ট কবি যেমনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলেরই আসন হবে-এই আর যায় কোথায়। ভদ্রলোকটিকে সকলে মিলে যেন চিবিয়ে খাবার মত করলেন। বেচারা অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বসে রইলেন।.....বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঐ অল্প সময়ের মধ্যে যা স্বীকৃতি পেয়েছেন সেটা তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে অস্বীকার করবারও উপায় নেই।” (পৃঃ ২১, ১৩৯৮ সং) ৮ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ফিরে যান। এই বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ১৯২১ ৪ঠা সেপ্টেম্বরের আগেই নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম আলাপ-সেই আলাপের সম্ভাব্য তারিখ ১৯২১ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে যেকোন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন তারই কোন একটি দিনে।

এই সাক্ষাতের পরেই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ১৯২১ সালের পূজোর বন্ধে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে এই প্রথম শান্তিনিকেতন গেলেন। ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৯২০ সালের ৪ঠা মার্চ শহীদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। নজরুল শান্তিনিকেতনে কতদিন ছিলেন এবং কী কী বিষয়

সাহিত্যিক।

নিয়ে আলাপ পরিচয় হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় না। অনেকেই বলে থাকেন যে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা বের করার পরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯২২-৬ই জানুয়ারী ‘বিজলী’তে যে সময় ‘বিদ্রোহী’ বেরিয়েছিল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯২-১৯৮৫) তথ্যানুযায়ী সে সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন না। তিনি ১৫ই জানুয়ারী মাত্র দুদিনের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তার আগে ১৯২১-২৯শে ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯২২ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন। কাজেই অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬২) এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৬৫) প্রদত্ত বিবরণ পুরোপুরি অসত্য। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, পরের দিন সকালে (৭ই জানুয়ারী ১৯২২) এ যে কবি (নজরুল) চারখানা ‘বিজলী’ নিয়ে গেল, বললে, ‘গুরুজী’র (রবীন্দ্রনাথ) কাছে নিয়ে যাচ্ছি’ ‘বেশ ফিরে এসে বলেন তিনি দেখে কি বললেন’ বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে ‘গুরুজী’ ‘গুরুজী’ বলে চৈঁচাতে থাকে। ওপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘কী কাজী অমন ঝাড়ের মত চৈঁচাচ্ছে কেন, কী হয়েছে?’ ‘আপনাকে হত্যা করবো, গুরুজী আপনাকে হত্যা করবো।’ - ‘হত্যা করবো, হত্যা করবো কী, এস ওপরে এসে বোস।’ - ‘হ্যাঁ সত্যিই বলছি আপনাকে হত্যা করবো, বসুন, শুনুন। কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে ‘বিজলী’ হাতে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি তাঁকে গুনিয়ে দিলো। তিনি শুদ্ধ বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললে হ্যাঁ কাজী, তুমি আমাকে সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার কবি প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। (পুরানো কথা, মাসিক বসুমতী কার্তিক ১৩৬২) অবিনাশচন্দ্র যে তারিখ এবং যেভাবে ‘গুরুজী আপনাকে হত্যা করব’ বলে নজরুল চিৎকার করতে করতে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন সে বর্ণনা নিতান্ত অমূলক এবং উল্লিখিত তারিখও ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের শান্ত অখচ গম্ভীর ব্যক্তিত্বের কাছে ওভাবে চিৎকার করা যায় না এবং নজরুল স্বভাব লাজুক ছিলেন, স্থান কালপাত্র ভেদ তিনি বুঝতেন-কোথায় চিৎকার করা যায় আর কোথায় যায় না এই বোধশক্তি তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ও প্রায় অবিনাশ বাবুর মত একই কথা বলেছেন, “জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি-অতি বাকপটুকেও টোক গিলে কথা বলতে শুনেছি-কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলে যে তিনি তা পারেন। তাই একদিন সবালবেলা -দে গরুর গা ধুইয়ে’ এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে উঠলেন-কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না।” (আমাদের নজরুল, কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

কার্তিক-পৌষ ১৩৫১, পৃঃ ৩৮) রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কোন এক সময়ে নজরুল বিদ্রোহী কবিতা তাঁকে শোনাতে পারেন তবে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পরই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তা তথ্য হিসেবে ভ্রান্ত। ১৯২২ সালের ১৬ই জানুয়ারীতে দুতিন দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্যলিখিত ‘মুক্তধারা’ নাটকটি সাহিত্যরসিক বন্ধুদের শোনানোর জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, সে সময় নজরুল ‘বিদ্রোহী’ কবিতা তাঁকে শুনিতে থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং আশীর্বাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি নজরুল লিখেছিলেন তার মধ্যে সেদিনের সুখস্মৃতি বর্ণিত হয়েছে-

: বক্ষে ধরে তুমি

ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস।

(অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি : নতুন চাঁদ)

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের শান্তিনিকেতনের কলাভবনে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়েছিল তা নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর (১৯০৯-১৯৭৩) স্মৃতিকথা থেকে স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও গেলেন না (১৩২৮ আশ্বিন); তিনি আছেন উত্তরায়ণের প্রান্তর মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে। পূজাবকাশ বলিয়া অতিথি সমাগম কিছু কম নয়। বাঁকুড়া হইতে আসেন অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন.....মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছেন কাজিন্স (১) দম্পতি.....। এছাড়া আসেন অধ্যাপক শহীদুল্লা ও তরুণ কবি নজরুল ইসলাম”। (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড ২য় সং পৃ ১১০) নিশিকান্ত বলেছেন, “গুরুদেবের পাশে দুজন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তাঁদের একজনকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে বললেন-ঐ দেখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা গিয়ে নজরুলের সান্নিধ্যেই বসলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ-পরা, কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন। তিনি মুহম্মদ শহীদুল্লা। তিনি কবিগুরুকে বলছিলেন ট্রেনে আসতে আসতে কাজী সাহেব আপনার ‘গীতাঞ্জলি’-র সব কটা গান আমাকে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবি গুরু বললেন,-তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতি শক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলির গান সবতো আমারই মনে থাকে না। কাজী সাহেব বললেন-গুরুদেব, আমি আপনার কণ্ঠে আপনার একটি গান ও একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই। শুনে কবিগুরু বললেন, সে কি? আমি যে তোমার গান ও আবৃত্তি শোনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি, তাড়াতাড়ি গুরু করে দাও, আমাকে আবার রাত্রিবেলায় লেখায় ব্যাপৃত হতে হবে। নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি গুরু করলেন ‘আগমনী’ কবিতাটি (একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন)। আবৃত্তির পরে কবিগুরু তাঁকে গান গাইবার আহ্বান জানালেন। এবার তাঁর কণ্ঠে কোটি বিষাদঘন করুণ সুর বেজে উঠল-“কোন সুদূরের চেনা বাঁশি ডাক শুনেছিস ওরে চোখা।” (আমার বিশেষ স্মৃতিতে নজরুল, কথা সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ পৃ ১১৬১-

সাহিত্যিকী

৬৩) পরবর্তীকালে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী এই বিবরণই দিতে গিয়ে বার্ষিক্যবশত কিছু স্মৃতি বিভ্রম ঘটিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন ‘মোসলেম ভারত’ মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখা নেওয়ার জন্য নজরুল ও আফজল-উল হক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। নজরুলের সঙ্গে আফজল-উল হক আসেন নি-‘মোসলেম ভারত’ এ রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা বেরোয়নি। শহীদুল্লাহ সাহেবের নামের স্থলে আফজল-উল হকের নাম সুধাকান্ত বলে ফেলেছেন বলে মনে হয় কারণ সুধাকান্ত ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁরই মারফৎ ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের নজরে এসেছিল। ‘মোসলেম ভারত’ এ সুধাকান্ত লিখতেন বলে নজরুল ও শহীদুল্লাহ সাহেব যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তাঁদের দেখভাল করার জন্য দায়িত্বভার সুধাকান্তের ওপরই তিনি অর্পণ করেছিলেন। আবদুল কাদিরও এরকম তারিখের ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন যে ১৯৩০ জুন-জুলাইয়ে (১৩৩৭ আষাঢ়) দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুল দেখা করেছিলেন ১৯৩১ ৩০শে জুন তারিখে। দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথ তখন শারীরিক কারণে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আবদুল কাদির যে তারিখ দিয়েছেন সে সময় রবীন্দ্রনাথ দেশের বাইরে ছিলেন। ‘বর্ষবাণী’র সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে নজরুল দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন ১৯৩১ ২০শে জুন, সঙ্গে অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো), মনুথরায় (১৮৯৯-১৯৮৮) প্রমুখ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরা সবাই দেখা করেছিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ অখিল নিয়োগী ‘রবীন্দ্র স্মৃতিকথা’ প্রবন্ধে বলেছেন-

ঃ আমরা সবাই কাজীদাকে ধরলাম তীর্থাত্রার যেমন
পান্তার প্রয়োজন, তেমনি কবিসঙ্গমে আর এক কবির সঙ্গে
হওয়াই সব চাইতে প্রশস্ত ও মহলজনক।.....
বললেন-বেশ কবির পায়ের ধূলা নিতে যাবে
এরজন্যে আবার দিনক্ষণ দেখবার প্রয়োজন কি? কাল খুব
ভোরে উঠেই যাত্রা করা যাক।.....
.....আমরা কাজীদাকে দলপতি করে কবি সন্দর্শনে রওনা হলাম।

....যথাসময়ে পৌছে খবর পাঠাতেই কবি তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। তিনি হয়তো কিছু
লিখছিলেন, কিন্তু কবি নজরুলের নাম শুনেই আমাদের তাড়াতাড়ি দর্শন দান করলেন।
(শিক্ষাব্রতী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, পৃ ১৪৫-৪৬)

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্র-জীবনী’-র
‘তৃতীয় খন্ডের’ ৪৪০ পৃষ্ঠার (১৩৯৭ সং) পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন “নজরুল এই
সাক্ষাৎকারের কথা” ১৩৩৮ সালের ‘স্বদেশ’ পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ
করেন। নজরুল লিখলেন; ‘কবি হেসে বললেন, ‘সজনে গাছকে কোন রকমে উপেক্ষা
করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে।.....এই রকম আর
একটি জীবের নাম করা চলে-দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে
সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।’ আমরা সবই উৎসুক হয়ে উঠলুম।
তিনি মুখটিপে বললেন মুরগী’। ‘শনিবারের চিঠি’র মাধ্যমে কিছু কাল হইতে সজনীকান্ত

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

দাস রবীন্দ্র-বিদূষণে আত্মনিয়োগ করেন। হাস্য পরিহাসছলে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকেই 'সজনে গাছ' ও মুরগী বলিয়াছেন।" সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে এই প্রসঙ্গ নিয়ে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সাহিত্যিক 'মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করলেন।.....পূর্বের 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী'র যা মনে দিল, নতুন করিয়া সাহিত্যিক মোরগের উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত, রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া।.....আমরা 'জয়ন্তী সংখ্যা' প্রকাশ করিয়া ব্যঙ্গস্রুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র বিদূষণ করিয়া বসিলাম।" 'নবীন কবি' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কবিতার প্রশংসা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেছিলেন, "একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষে আর একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে উৎসাহ, সে সাহিত্য নয়, যে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনো দিন আমি যোগ দিইনে যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।" ৬

রবীন্দ্রনাথের কাছে জাহানআরা তাঁর কাগজ 'বর্ষাবাগী'র জন্য কবিতা চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষাবাগী'তে লিখেছেন। 'বর্ষাবাগী'র পূর্বনাম ছিল 'রূপরেখা'— রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেছিলেন। এই নামে ১৩৪০ ও ১৩৪১ পত্রিকা বেরোয় কিন্তু পরে ঐ নামে একটি চলচিত্র বিষয়ক পত্রিকা বেরবার ফলে ১৩৪২ এ নাম পরিবর্তন করে 'বর্ষাবাগী' নাম রাখা হয়। বার্ষিক পত্রিকা হলেও 'বর্ষাবাগী'র প্রকাশ অনিয়মিত ছিল,— ১৩৫৯ পর্যন্ত 'বর্ষাবাগী' বেরিয়েছে। সতেরো বছরের মধ্যে 'বর্ষাবাগী'র মোট এগারোটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। 'রূপরেখা' ও 'বর্ষাবাগী'তে নজরুল রচনার প্রকাশের তালিকা—

- ১৩৪০- সুখ বিলাসিনী পারাবত ভূমি
- ১৩৪২- কোনো স্মরণবহি হতে
- ১৩৪৩- গান
- ১৩৫৭- স্বপন মায়া
- ১৩৫৯- গান

আলতাফ চৌধুরীর (১৯০৬-১৯৯১) ভগ্নী জাহানআরা চৌধুরীর সঙ্গেও নজরুলের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জাহানআরা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন, ফ্যাশনদুরন্ত স্মার্ট মহিলা তাঁর সঙ্গে নজরুলের অনেক পত্রিনিময় হয়েছে কিন্তু চিঠিগুলি তিনি কাউকে দেন নি এমন কি কাউকে দেখান নি পর্যন্ত। ১৯৮৬ সালে কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাসগৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। চিঠিগুলি পাওয়া গেলে নজরুলের আর এক প্রেমের অধ্যায় জানা যেত। ৬

সাহিত্যিকী

৫ ১ কবিতায় হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর জীবনী লেখার জন্য প্রকাশক টাকা দিয়ে নজরুলকে দার্জিলিঙে পাঠিয়েছিলেন যাতে নিরিবিলিতে কাজটা শেষ করতে পারেন কিন্তু সে ঝুঁড়ে বালি। সে সময় নাট্যানিকেতনের প্রবোধচন্দ্রগুহ (১৮৮৫-১৯৫৯) দলবল নিয়ে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন সেই দলে নীহারবালা ছিলেন। সারা দিনরাত গান বাজনা হৈ হুল্লোড় করেই সময় কেটে যায়-জীবনী লেখার কাজ কিছুই অগ্রসর হয়নি। পরে তিনি কিছুটা লিখেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। অসমাপ্ত কাব্যজীবনী ‘মরুভাঙ্গর’ নামে বেরোয় ১৯৫০ সালে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের আরও কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। ১৯২২, ২৫শে জুন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। সত্যেন দত্তের মৃত্যুতে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয় (১১ই জুলাই ১৯২২ মঙ্গলবার)। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ৯ই জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন। ঐ শোকসভায় নজরুল ‘সত্য কবি’ (অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চলে) কবিতাটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ‘সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত’ (বর্ষার নবীন মেঘ ঘনাইয়া এলেন ধরনীর পূর্বদ্বার) দীর্ঘ কবিতাটি অশ্রুধ্বং কণ্ঠে পাঠ করে শোনান। ১৩ই জুলাই ১৯২২ এর আনন্দবাজার পত্রিকায় এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় এই ভাবে-

সত্যেন্দ্র স্মৃতি পূজা

গভবল্য রামমোহন লাইব্রেরীতে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রদ্ধা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এত অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল যে সেই সুপ্রশস্ত হলেও স্থান সংকুলান হয় নাই। শ্রী চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় কবি সম্বন্ধে একটি সূচিক্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সত্যেন্দ্র শিষ্য তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘সত্যেন্দ্রনাথ’ (সত্য কবি) শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণিত মৃত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছেন যে, স্বর্গীয় কবির কথা বলিবার সময় তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসিয়াছিল।

এই শোক সভাতেও রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে নিজের পাশে বসিয়েছিলেন। এই নিয়ে পূর্বের মত এই সভাতেও গুঞ্জন উঠে। শান্তিপদ সিংহ এই সভাতেও উপস্থিত ছিলেন। সভায় এই বিষয় নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ‘নজরুল কথা’ গ্রন্থে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন-

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

ঃ রামমোহন লাইব্রেরীতে পৌছে দেখলাম ভাল বসবার জায়গা বা আসনগুলি দখল হয়ে গেছে। সামনের দু-তিন সারিতে কিছু ফাঁকা আসন আছে। ঐ আসনগুলি যে বাদেদের জন্যে সংরক্ষিত তা আন্দাজ করে নিতে দেবী হলো না।-----

বিশ্বকবি মঞ্চে প্রবেশ করলেন এবং প্রায় পিছু পিছু কবি নজরুলও একেবারে মঞ্চের উপর। কবি গুরু তাঁর পাশের আসনেই বসলেন। নিচের সেই গুন গুনানি, তাঁদের হিসেবমত কবিগুরু পাশে বসবার যোগ্যতা বাকী নজরুলের নেই। অথচ ঘটনা চক্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের পাশে বসবার স্থান পাচ্ছেন সব বড় বড় সভায়। কি দুর্দৈব।

কবি গুরু তাঁর ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের অনেক প্রশংসা করলেন এমন কি তিনি সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ যে তাঁর লেখার ছন্দের চেয়েও ভাল তা স্বীকার করে তারপর স্বরচিত একটি কবিতা পড়লেন।.....

পরে রবীন্দ্রের ইঙ্গিতে নজরুল উঠলেন তাঁর সদ্যরচিত ‘সত্য কবি’ পড়লেন।.....যখন কবি পড়ছিলেন, মনে হলো রবীন্দ্রনাথ নিবিষ্ট মনে তা শুনছেন। শেষে তাঁর সঙ্গে মৃদুহাসির ভেতর তাঁদের কি যেন আলাপ হলো। তারপর সভা ভাঙ্গার পর একটা বিশী দৃষ্টিকটু ঘটনা ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথ চলে যাবার পব নজরুল মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। কিন্তু ঐ বড় বড় লিখিয়েরা কবির সঙ্গে কোন ব্যবহালাপ না করেই চলে গেলেন, যেন তাঁদের কোন লড়াইয়ে যেতে হবে। আমরা দুজনে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলাম।
(পৃ ২৪-২৫, ১৯৯৮ সঃ)

‘ধূমকেতু’ পত্রিকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবার আগে নজরুল নাবি-শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন-এ তথ্য নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর ‘নজরুলের সঙ্গে কারাগারে’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭) বই থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এখানেও সেই একই সমস্যা ঠিক কোন সালে এবং কোন তারিখে দেখা হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা প্রকাশিত হবার আগে (১৯২২, ২৬শে সেপ্টেম্বর) এই সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রজীবনী’ অবলম্বন করে একটা সম্ভাব্য তারিখ নির্ণয় করা যায়। ১৯২২ সেপ্টেম্বর মাসের পর রবীন্দ্রনাথ চারমাসের জন্য সিংহল ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ফলে এই সাক্ষাৎ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে দিকেই হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই সাক্ষাৎকারের কথা নজরুল নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকে বহরমপুর জেলে থাকাকালীন অবস্থায় বলেছিলেন। একদিন সেলে বসে নিবিষ্টমনে চিঠি লিখছেন। নরেন্দ্রনারায়ণের কৌতুহল হল কাকে এমন নিবিষ্টচিত্তে চিঠি লিখছেন। চিঠি লেখার রহস্য নজরুল নিজেই ফাঁস করলেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন এবং চিঠিটি পড়ে শোনাবেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ লিখছেন-

সাহিত্যিকী

ঃ 'বাক্তী হাসতে হাসতে বললেন একবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলুম আর ছিলুমও দিন কয়েক।
একদিন দুপুরের পরে কবি বসেছিলেন একা তাঁর 'দেহলী'র বারান্দায়। বেতের একখানা পিঠ
উচু চেয়ারে। পায়ের কাছে বসে ওর একখানা পা টেনে নিয়েছিলুম বেলের উপর। ইচ্ছে ছিল,
একটু টিপে দেব। তারস্বরে কবি চোঁচিয়ে উঠলেন ওরে ছাড় ছাড় হাড়গোড় আমার ভেঙ্গে
গেল।'

অপ্রস্তুতের একশেষ। সরে বসেছিলুম। আমার দিকে ফিরে চেয়েছিলেন কবি। চোখের তারা
পিটপিট করছিলেন। মুখে মৃদু হাসি। বলেছিলেন, - 'কটা গান লিখলে আজ? নাকি খালি
চ্যাচালেই?'

মুখ ভার করে মাথানীচু করে আমি বসেছিলুম, মাঝে মাঝে কী মনে হয়, জানেন? কী?

✎ 'একটা লাঠির বাড়ি মাথায় মেরে আপনাকে শেষ করে দি?'
'কেন? কেন?'

'তাহলে আপনার পাশাপাশি চিবকাল লোকে আমারও নাম করবে। আর আমার ছবিও আপনার
ছবির পাশেই ছাপা হবে।'

'কী সর্বনাশ! ওরে কে আছিস শীগগির আয়
এ পাগলের অসাধ্য কিছু নেই।'

'কবির কণ্ঠ একটু উচুই বা হয়েছিল। কয়েকজন এসেও পড়ছিল। সবিত্তারে কবি আমার কণ্ঠার
ফিরিঙ্গি শুনিতে দিলেন।' (পৃ ৬৬-৬৭)

এই সব বিবরণকে যদি সঠিক বলে ধরা যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে
অপরিমেয় স্নেহের প্রশ্রয় পাচ্ছেন এবং তার ফলে নজরুলের ছল্লোড় প্রকৃতির পরিচয়ও
পাওয়া যাচ্ছে। তাবলে তিনি কোনদিনই কবিকে অশ্রদ্ধা করেন নি- সারাজীবন তিনি তাঁর
প্রতি শ্রদ্ধাবনত ছিলেন। জেলে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বার বার বলতেন।
নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর জবাবীতে জানা যায় "ভারতবর্ষ কোনদিনই কবির কাস্তাল
নয়।.....ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস।.....রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য সম্ভবত কেউ
নয়।" (নজরুল সঙ্গে কারাগারে পৃ ৪১-৪২) এরকম প্রসঙ্গ কিংবা আলাপ পরিচয়ে টুকরো
টুকরা কথা মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ বা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। যেমন 'হিন্দুমুসলমান'
প্রবন্ধের গোড়াতে তিনি লিখেছেন।-

ঃ একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে।
গুরুদেব বললেন দেখ, যে ন্যাজ বাইরের ডাকে কটা যায় কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?
(রুদ্রমঙ্গল)

সমস্যা দাঁড়াচ্ছে এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের কোন সময়ে এবং
কোনখানে হয়েছিল তা নির্দেশ করা কঠিন। নজরুল কিংবা রবীন্দ্রনাথ কেউই কোন ইঙ্গিত
বা হুঁশি দেন নি। এরকম আরও একটি প্রসঙ্গ রয়েছে যেখানে নজরুল কাজী মোতাহার
হোসেনকে ১৯২৮ ২৪শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লিখেছেন-

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

☞ : রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, দেখ উম্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত ☞ কীটসের মত খুব বড় একটা ট্রাজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ।

এই কথাবার্তা কোনদিনের সাক্ষাতের সময় হয়েছিল তারও কোন হৃদিশ মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে শান্তি নিকেতনে গিয়ে থাকতে, ছাত্র/ছাত্রীদের গান শেখাতে এবং দিনেদিনে ঠাকুরের (১৮৮২-১৯৩৫) কাছে গান শেখার কথা কয়েকবার বলেছেন কিন্তু এই হট্টগোল মধ্য তিনি থাকতে ভালবাসেন তাঁর শান্তিনিকেতনের শান্ত নিস্তরঙ্গ নিভৃত জীবন কেন ভাল লাগবে? নজরুলকে সস্তা হাততালিতে মোহগস্ত হতে নিষেধ করেছেন, সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছিলেন। মোহিতলালের মতো তিনিও তাঁকে নিত্যকালের রসলোকের জাতিময় আলোকে কবিতা গান লেখার কথা বলেছেন তবে মোহিতলালের মতো তিনি অভিভাবক করেন নি। তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সে কথার নিগূঢ় অর্থ না বুঝেই ওটি কবিতায় ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন-

: ওরু কন, তুই করেছিস ওরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা। ☞
(আমার বৈফিযৎ সর্বহার্য)
: বলেছিলে হেসে একদিন
তববারি দিয়ে তুমি চাঁচিতেছ দাড়ি।
(অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি : নতুন চাঁদ)

ব্যক্তিগত হবার আগে আলমোড়ায় নজরুল জনাজয়ন্তী অনুষ্ঠান গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) এবং আরও কয়েকজন মিলে করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে নজরুলও ছিলেন। গজেন্দ্রকুমারের বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে ঐ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় নজরুল দাড়ি চাঁচার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন “কবিগুরু” আমাকে তববারি দিয়ে দাড়ি চাঁচতে নিষেধ করেছেন, বলেছেন সূর্যের সাধনা করতে। সেই থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গী নতুনতর রূপ নিয়েছে। সেই থেকে আমি অখন্ডের দিকে এগিয়ে চলেছি।” সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘যাত্রী’ বইতে দাড়ি চাঁচার প্রসঙ্গে বলেছেন, “সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দুজনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তাঁর স্বরচিত গান শোনাতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলেন ‘চল চঞ্চল বাণীর দুলাল,’ ‘ধ্বংসপথের যাত্রীদল’ আর ‘শিকল পরা ছল’। রবীন্দ্রনাথ খুশি হলেন গান শুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বললেন-নজরুলের নিজস্ব একটা জোরালো ধরণ আছে। সেদিন দু’চারটি কথা যা নজরুলকে বললেন-“শুনেছি তুমি নাকি মন যোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছো। বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কী তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচার জন্যে? রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলো নিয়ে নজরুল একটা কবিতা দিয়েছিল। তার কবিতা প্রমাণ করল যে সে রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ধরতে পারেনি।” (খ ১, পৃ ১৪৪-৪৫, ১৩৫৭ সং) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনদিন নজরুলকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে

সাহিত্যিকী

গিয়েছিলেন তা উল্লেখ করেন নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রজীবনী’ অনুসরণ করে বলা যায় যে ১৯২৩ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৫ অক্টোবরের মধ্য রবীন্দ্রনাথ বার সাতেক কলকাতায় এসেছেন। এই অবস্থান কখনো একদিনের জন্য কখনোবা মাসখানেকের মেয়াদে। সৌমেন্দ্রনাথ ১৯২৫ এর জুলাই আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে কোন একদিন নজরুলকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। ‘যাত্রী’ বইয়ের আর এক স্থানে রবীন্দ্র-নজরুলের সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে “বিশ্বে সাহিত্যের কথা দূরে থাক নিজের দেশের সাহিত্যের খবরও সে (নজরুল) খুব কমই রাখত। একবার প্রায় জোর করে বললেই হয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে কালিদাসের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।” এই সাক্ষাৎ কোন্ তারিখে হয়েছিল তা বলা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের ‘ধুমকেতু’ ‘লাঙ্গল’ কাগজে আশীর্বাদী দিয়েছেন, ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য তাঁকে উৎসর্গ করেছেন, হুগলী জেলে অনশনরত অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন তবু এই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন বিদেশী শব্দ প্রয়োগ নিয়ে নজরুলের মসীযুদ্ধ লেগেছিল। ১৯২৭, ১৩ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজের ‘রবীন্দ্র পরিষদ’, রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান। পরিষদের সভাপতি ছিলেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২)। সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন তার অনুলিখন করেছিলেন ছাত্ররা। সেই অনুলিখিত বক্তৃতার একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

: সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখন মানুষ তালতুলে নৃতনের আফালন করে। পুরাতনের পায়ে অমৃত-রস পরিবেশন করার শক্তি যাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্ণতা চড়া গলায় প্রমাণ করার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অস্ত্রের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম তিনি ‘রক্ত’ শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন ‘খুন’। পুরাতন রক্ত শব্দের তাঁর কাব্যে রাস্মা রং যদি না ধরে তাহলে বুঝব সেটাতে তাঁর অকৃতিত্ব। তিনি রক্ত গোলাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নূতন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে উঠবার জন্যে যাদের প্রাণপণ চেষ্টা তারা উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাদের কল্পনায় আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণ বর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাদের উষ্মাকে নিউমার্কেট ‘খুন’ ফরমাশ করতে হয় না।

প্রাচ্যবাসীর ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ‘রবীন্দ্র পরিষদে কবির অভিভাষণ’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক ‘বাস্তবতার কথা’ ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৭ (৪ঠা পৌষ ১৩৩৪) সংখ্যায় যেখানে বাঙালি হিন্দু কবির কাব্য বলা হয়েছিল সেখানে ‘হিন্দু’ শব্দটি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ‘একজন বাঙালি কবি’ ছাপা হয়েছিল এবং এসব পড়েই নজরুল মর্মান্বিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ‘বড় পিঁপীতি বালির বাঁধ’ নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেন। এবং সাপ্তাহিক ‘আত্মশক্তি’র ৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৭ (১৪ই পৌষ ১৩৩৪) সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি-

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

ঃ.....তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।.....এই আরবী ফারসী শব্দপ্রয়োগ কবিতায় শুধু আমি করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটি জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা শেরওয়ানী-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্বেষ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় মিয়া সাহেব। মৌলানা সাহেব আর নারদমুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল।.....

তিনি ইটালিকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে-“উতারো ঘোমটা তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। ‘ঘোমটা খোলা’ শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। ‘উতারো ঘোমটা’ আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছেই অপরাধীই হতাম। কিন্তু ‘উতারো’ কথাটা যে জ্ঞাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা’ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো শোনবার লোভেই ঐ একটি তিন-দেশী কথার প্রয়োগ অপূর্বরূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনা এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পড়িত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

‘খুন’ আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকি রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু “খুন” নয়-বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্য লক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাঙালা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি ‘জেওর’ পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুব সুরতাই দেখায়।

আজকের কলা লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলংকারই ত মুসলমানি ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সবল শিল্পীই স্বীকার করেন। পড়িত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তাছাড়া যে ‘খুনের’ জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায় কালার বক্সে (Colour box-এ) এবং তা “খুন করা”, “খুন হওয়া” ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন খারাপি হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।.....

সাহিত্যিকী

কবি গুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায়না, চায় মাঝে মাঝে বেহালায় সাথে সারেস্বীর সুর শুনতে, ফুলবনের বেগবিলের গানের চিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অঙ্কন হয়ে গেল যারা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য সভায় ভিড় না করে হিন্দু সভারই মেসার হন গিয়ে।.....

❶ সবচেয়ে দুঃখ হয়, এখন দেখি কতগুলো জ্ঞানাকি পোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবীত্বের আক্ষালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা লোকগুলোই, যারা রাতদিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত-সুন্দর মনকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করে তুলছে? আর আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁরশত্রু?

কবি গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচণায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

‘সওগাত’ মাস ১৩৩৪ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করা হয়েছিল, “রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইয়াছে, লজ্জাও পাইয়াছে কারণ ‘শনিবারের চিঠি’ লেখকদের নিকট হইতে আমরা একথা শুনিতে প্রস্তুত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা একথা শুনিব ইহা আমরা কল্পনাও করি নাই।” প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বীরবল নামে ‘বঙ্গসাহিত্যে খুনির মামলা’ লিখে এই বিরোধের অবসান ঘটান। তাঁর প্রবন্ধটি ‘আত্মশক্তি’র ১৩৩৪ ২০শে মাঘ শুক্রবার (১৯২৮ ৩রা ফেব্রুয়ারী) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন-

❷ রবীন্দ্রনাথ যে কাজি সাহেবকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন,-এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে সভায় তিনি ও কথা বলেন সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, কোন ও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ স্বরূপ তিনি “খুনের” কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন নি।.....

বাংলা কবিতায় যে “খুন” চলছে না, এখন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজি সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহুপূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার বার্তা উল্টে গেলে “খুনের” সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এসব খুন এত বেমানাম খুন যে, হঠাৎ তা বারও চোখে পড়ে না।

তারপর কাজি সাহেব এই বলে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অন্তরে আরবি-ফার্সি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজী সাহেবের এবিলাপ প্রতাপমাত্র। কেননা, যদি তাঁর ও-রকম কোন ও কুমতলব থাকত তাহলে তিনি বহু পূর্বে আমার ভাষার উপর খড়্গহস্ত হতেন।.....

.....কাজি সাহেব আমাদের বেশের উপর মুসলমান বেশের প্রভাবের কথা যা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক।.....

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

❧ সর্বশেষে খুনের একটি গুনের কথা উল্লেখ করব-যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন নি। কবিতা লিখতে হলে মিলের প্রয়োজন-অন্ততঃ বাংলা কবিতাতেও তাই। এখন বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তার শতাংশের একাংশ পাওয়া যায় না।.....অন্ততঃ কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয় তাহলে Reason এর খতিয়ে Rhyme কে ভালাক দিতে হয়। আর কে না জানে Rhyme এর খতিয়ে Reason এর সাতখুন মাপ।

প্রথম চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'বড়ুর পিরীতি বালির বাঁধ' লেখার পেছনে অনেকগুলি হেতু আছে। শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজের বক্তৃতাই একমাত্র কারণ নয়। সেসময় তরুণ লেখকদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' 'কল্লোল' 'কালি-কলম' প্রভৃতি কাগজ পরস্পরের মধ্যে উত্তোর-চাপান করে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথকে এই নিয়ে সালিশী করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে উদ্ভূতপক্ষ পরস্পরের পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ ও এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবে নজরুলও ক্ষুব্ধ হন রবীন্দ্রনাথের কোন কোন উক্তি। তিনি মনে করতেন যে, উক্তিগুলো হয়ত তাঁকেই লক্ষ্য করে। তিনি তরুণ সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জড়তা ভাঙ্গার জন্য কবিতা গান লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন নি-তার মতো দেশপ্রেমিক খুব কম লোকই ছিলেন। তবে তারুণ্যের নামে বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথ ❧ পছন্দ করতেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৯০-১৯৭৭) লেখা পত্রটি ১৩৩৪ মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ হওয়া মাত্রই কাজির বন্ধুরা বোঝালেন যে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকেই খোঁচা দিয়েছেন-নজরুলও তাই মনে করলেন। চিঠির মধ্যে আছে-

: তারুণ্য নিয়ে যে একটা হাস্যকর বাহবাফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক-সাণ্ডাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অষ্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয়, সেটা ভালই লাগে কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব করে বেড়ায়, সবলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চায় (আমি কচি খোকা) তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অবশ্যে ঝুনো হয়ে উঠছে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণীতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেটাকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী করে বেড়ায়, 'আমরা তরুণ, আমরা তরুণ', করে আকণা মাত করে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানবৃত্ত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকাব্য বলে গর্ব করিনে।

'প্রবাসী' অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে মোহিতলালের কবিতার মধ্যে অকৃত্রিম পৌরুষের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

: অকৃত্রিম বলছি এই জন্যে, তাঁর লেখায় ভাল-ঠোকা পায়তারা-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর সে সার্বঙ্গের খেলোয়াড় হ'তে লজ্জাবোধ করে।

সাহিত্যিকী

এই উক্তিকেও নজরুল বুঝলেন তাঁকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। ঐ প্রবন্ধের আরও এক জায়গায় রয়েছে-

: অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে-যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ। আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ এই আফ্রাফন করার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেসক্রিপশনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেদের জীবন যাত্রায় 'দরিদ্র নারায়ণে'র ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি-ভালো রকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বাচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্রকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের স্বাক্ষর বাড়াবার জন্যে সর্বদাই খাল মসলার মতো ব্যবহার করেন।

❶ এসব মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একজনকে লক্ষ্য করে বলেন নি- সেসময়কার বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার নামে অশ্লীল যৌনতার যে নিরাভরাগচিত্র আধুনিকতার নামে তরুণ লেখকরা তুলে ধরছেন তারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন-নীচতলার মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলতে গিয়ে যেভাবে পাক খেটেছেন তার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল। কিন্তু নজরুল সেই সময়কার পরিবেশ ও বাতায়ণ লক্ষ্য না করেই সবকিছু মন্তব্যকে নিজের গায়ে নিয়ে নিলেন। আস্তে আস্তে জ্বালা ধুমায়িত হতে থাকে শেষে সেটি 'বড়র পিরীতি বালির বাধ'-এ বিস্ফোরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ সাময়িক ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সি শব্দ প্রচলনের বিরোধী ছিলেন না বরং কাজী আবদুল ওদুদের কাছে কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস মুসলমানী শব্দের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের চিত্র ভালভাবে ফুটে উঠে একথা তিনি বলেছিলেন। 'খুন' শব্দটা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার কথা নয় কিন্তু তখনকার সাহিত্য পরিবেশে দু'জনকে লড়িয়ে দিয়ে চেলাচামুন্ডরা মজা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন কোনো নতুন সম্ভাবনাকে ধিক্কার জানান নি, তিনি সবসময় ও সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ছিলেন, তাঁর মধ্যে, একটা গ্রহিষ্ণু শক্তি বরাবরই ছিল। 'বড়র পিরীতি বালির বাধ'-এর রেশ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি-মনের মধ্যে অভিমান নজরুলের বেশ কিছু দিন ধরে ছিল। সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এর 'চান্দাচুর' নামক ব্যঙ্গাত্মক বিভাগ যেটি নজরুল স্বয়ং লিখতেন তারই একটি সংখ্যায় (১৯২৮, ৪ঠা অক্টোবর) "গুধু গাভী" শীর্ষক একটি মন্তব্য থেকে তার আঁচ পাওয়া যায়।

❷ : রবীন্দ্রনাথ তার নামিত কোন এক পরিষদে তরুণ তরুণী সাহিত্যিকদের লেখার উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'দুধ নেই গুধু কেনা।' রবীন্দ্রনাথ দুধের এক্সপার্ট কিনা জানিনা। অন্ততঃ সর্কপোরেশনে মিউনিসিপ্যাল গেজেটে তো তাঁর নাম বেরুতে দেখিনি।

কিন্তু দুধ ছাড়া কি গুধুতে ফেনা হয়, ভাষাকে নিয়ে ফেনানো যাঁদের পেশা তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন।

কিন্তু তরুণ সাহিত্যিকরাও ত ইচ্ছা করলেই ওরকম ভাষায় কেরদানী দেখাতে পারে। যুক্তি না দিয়ে উপমাই যদি সবটা হয় তাহলে তারাও বলতে পারে, বুড়ো সাহিত্যিকদেরও গোয়ালঘরে দুধ নেই গুধু গাভী। গুধু ফেনাতে যদি ছানা না বেরোয় গুধু গাভীতেও ছানা বেরোয় না।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মান-অভিমানের পালা চললেও প্রথম থেকেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। নজরুল তাঁর গল্প উপন্যাস নাটকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান যথেষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। “হেনা” গল্পে (১৩২৬ কার্তিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত) বাঙালি যুবক ডাক্তার গাছের তলায় বসে গান গেয়েছে ‘এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে, বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে’। ‘ব্যথার দান’ গল্পে (১৩২৬ মাঘ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত) দৃষ্টিহীন দারী দুখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে- ‘আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো’, ‘আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বলে দিবস গেলে করব নিবেদন আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন’। ‘বাদল-বরিষণে’ গল্পে (১৩২৭ শ্রাবণ মোসলেম ভারত-এ প্রকাশিত) রয়েছে- “ভেজা মাটির আর খসখস এর ওমোট-ভরা ভারী গন্ধে যেন দম আটকে যাচ্ছিল; ও-ধারে কোটা কেয়া ফুলের আধকোটা যুথির, বেলির কুঁড়ির, ঝরা শেফালি-বকুলের দিল মাতানো খোশবুর মাঝে মাঝে পল্ল আর কদম্বের স্নিগ্ধ সুরভি মধুর আমেজ দিচ্ছিল। বর্ষার ব্যথা আমার দিকে গভীর মৌন চাওয়া চেয়ে শুধাচ্ছিল-এমন দিনে তারে বলা যায় এমন ঘনঘোর বরিষায়।” ঐ গল্পে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি গানের কলি রয়েছে- ‘এসো এসো সজল ঘন বাদল-বরিষণে’, ‘আমার নয়ন-ভুলানো এলে’। ‘বৃন্দ হারা’ পত্রোপন্যাসেও বিভিন্ন পত্রের ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্র কবিতা ও গানের পংক্তি আছে। যেমন নুরুকে মনয়ুর চিঠিতে লিখেছে “আমার মত গো-মুফুর কথা যদি গুনিস, তাহলে আমি বলি কি, তোর গুরুদেবের উদাত্ত নির্ভীক বাণীতে তুইত যোগ দিয়ে প্রদীপ কঠে বুক ফুলিয়ে বল-বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়/লভির মুক্তির স্বাদ।” মনয়ুরকে নুরুল হুদা লিখেছে, “আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আমরাই হৃদয়ের লুকানো সুপ্ত কথাগুলো এই গানের ভাষা দিয়ে এই বাদল রাগিনীর সুরের বেদনায় গলে পড়ছিল আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম-হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে/সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।।” রাবেয়া তার ভাবীকে লিখেছে, ‘সাহসিকা দু’একদিন দুট্টমি করে আমার ঘরে বেশ একটু জোড় গলায়, যাতে উনি শুনতে পান গান জুড়ে দিত-সখি, প্রতিদিন এসে ফিরে যায় কে।’ সাহসিকা রেবাকে চিঠিতে লিখেছে, “গুরুদেব সত্যি-সত্যিই গেয়েছেন,-ভাগ্যে আমি পথ হারালেম পথের মধ্যখানে। কোটি কোটি নমস্কার করছি এই মহাঋষির শ্রীচরণারান্দে এইখানে।” ইত্যাদি। পত্র পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি অবাধে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যেমন ‘নবযুগ’ প্রথম পর্যায় সম্পাদনার সময় ‘নবযুগ’ নামক সম্পাদকীয়র প্রথম অনুচ্ছেদেই রয়েছে “আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানা নব প্রভাতী ধরিয়াছে,- ‘পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরনে শনি বাঁশরী’। এসুর নবযুগের”। ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ শীর্ষক রচনার শীর্ষদেশেই রয়েছে ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছে অপমান/অপমানিত হতে হবে তাদের সবার সমান।’ মাঝে মাঝে কবিতার পংক্তিও প্যারোডিতে রূপান্তরিত করে সংবাদের শিরোনাম দিয়েছেন। যেমন ‘ধূমকেতু’তে বিভিন্ন

সাহিত্যিকী

সংবাদ শিরোনাম- আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরায়ণ সখা ফৈসুল হে আমার' শুধু প্যারোভিই নয় রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা পুনর্মুদ্রণ করেছেন। যেমন 'বহুযুগের ওপার থেকে আধার এলো আমার মনে' ১৩২৯ আষাঢ় সংখ্যা 'অলকা'র বেরিয়েছিল। গানটি ১৩২৯ ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসীর কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়। নজরুলও ঐ গানটি 'ধুমকেতু'র ২৬শে মাঘ ১৩২৯ অষ্টম সংখ্যায় 'মিষ্টিমুখ' বিভাগে 'বর্ষামঙ্গল' শিরোনাম দিয়ে গানটি পুণরায় মুদ্রিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে তো তিনি বারে বারে ফিরে এসেছেন! ১৮৮৭ মে (১২৮০ বৈশাখ) 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ভূলে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

ঃ বকুল ঝরিয়া মাধপরে চায়
কাহার চুলে?
কেই ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভূলে।

নজরুলের চোখের চাতক গানের বইতে (ডিসেম্বর ১৯২৯) ৮ম সংখ্যক গানে আছে-

ঃ কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুঃখ লয়ে কাঁদে
কেউ ভুলিতে চায় গীতি।।

রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্য ২৪ সংখ্যক গানে ১৩১৯ ৭ই বৈশাখ-

ঃ হারমানা-হার পরাব তোমার গলে

নজরুলের কবিতায় আছে-

ঃ এই হার-মানা-হার পরাই তোমার বেশে
(বিজয়িনী ছায়ানট, আশ্বিন ১৩৩২)

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে রচনাকাল ১৩২১, ১৪ই ভাদ্র-

ঃ এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার
ওয়ে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥ (গীতালি ১০ সংখ্যা)

নজরুলের কবিতায় আছে-

ঃ এক হাতে বাঁকা বাঁশের তরবার
(বিদ্রোহীঃ অগ্নি-বীণা)

অগ্নি-বীণা নামটিও ত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নেওয়া

ঃ অগ্নিবীণা বাজাও তুমি বেশন করে!
আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে।।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ ৩০শে চৈত্র সেখানে লিখলেন-

ঃ এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।
তোরের আকাশ রাঙ্গা হলরে
আমার পথ হল সুন্দর।। (গীতিমাল্য ২১ সংখ্যক গান)

নজরুল সেখানে লিখলেন-

ঃ বাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।। (প্রলয়োদ্ধাসঃ অগ্নি-বীণা)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

ঃ পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
বস্তুরী মৃগসম।

নজরুল লিখলেন-

ঃ মন-হৃগঃ ছুটে ফেরে; দিগন্তের দুর্লি'মোর দ্বিপ্ত
হাছাকার-প্রাণে
বস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাতির গন্ধ খুলে ফেলে গন্ধ-অক্ষ মন-হৃগমন!
(পুঞ্জারিণীঃ দোলন-চাপা)

রবীন্দ্রনাথ '১৪০০' সাল বগবিতায় নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত
করেছেন-

ঃ আজিবার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিবার কোনো রক্তরাগ-
অনুরাগে দিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের কণ্ঠে
আগি হতে শতবর্ষ পরে।। (চিত্রা)

নজরুল তার জবাবে বললেন

ঃ আজিবার যত ফুল-বিহঙ্গের যত গান
যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হ'তে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ!
আজি নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হয়ে মাতিয়াছে আমাদের যৌবন-বেলায়।
(১৪০০ সাল; চক্রবাক)

রবীন্দ্রনাথের রচনা নজরুল কত গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন এসব তারই উদাহরণ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ নিজের কাব্য সংকলন ‘সঞ্চিতার’ ক্ষুদ্র (১৯২৮, ২রা অক্টোবর) ও বৃহৎ সংস্করণ (১৯২৮, ১৪ই অক্টোবর) উৎসর্গ করেন। গ্রন্থের নামকরণ ‘সঞ্চিতা’ রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার কাছাকাছি প্রতিশব্দ। রবীন্দ্রনাথও বাংলা কাব্য পরিচয় সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ নজরুলের তিনটি কবিতা ‘দেখবো এবার জগৎটাকে’ ‘সিদ্ধ-তৃতীয় তরঙ্গ’ ‘পউষ’ নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গান নজরুলের সব থেকে প্রিয় ছিল। এইচ এমভি-র রিহার্সাল রুমের সংলগ্ন তাঁর নিদিষ্ট কামরায় বসে কোন সময় হয়ত গান লিখছেন কিংবা সুর দিচ্ছেন এমন সময় হয়ত রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর কানে ভেসে এল লেখা থামিয়ে তন্ময় হয় গান শুনতে লাগলেন। নিজের গান লেখা হল না সুরও দেওয়া হল না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন এই গানের কাছে তাঁর গান কিছুই নয়। ‘১৪০০ সাল’ কবিতায় তিনি বলেছিলেন-

ঃ আজি তব বরে
শত বেগু-বীণা বাজে আমাদের ঘরে।
তবুও পুরেনা হিয়া ভরে না ক’প্রাণ,
শতবর্ষ সাতরিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান।
মনে হয়, কবি,
আজো আছ অন্তপাঠ আলো করি,
আমাদেরি রবি। (চক্রবাক)

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি কত গভীর ছিল আর একটি ঘটনা থেকেও তারা প্রমাণ পাওয়া যায়। গানের রিহার্সাল রুমে কোন এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক নজরুলের কাছ থেকে কবিতা নেবার জন্য এসে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চেয়ে তাঁর গানের প্রশংসা করা মাত্রই নজরুল ক্ষেপে উঠলেন। ধমক দিয়ে বললেন, আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষতি হত না-রবীন্দ্রনাথের গান বেদমন্ত্র, তাঁর গান ও কবিতা আমাদের সাতরাজার ধন মানিক। লেখা নিতে এসেছেন নিয়ে যান, লেখা নিতে এসে এরকম আমড়াগাছি যেন আর না শুনি। এই বলে একগাছা কবিতার বাস্তিল তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন পছন্দমত কবিতা নিয়ে যেতে। গান লিখতে গিয়ে কবিতা লেখা প্রায়ই ছেড়েই দিয়েছিলেন। কবিতা লিখতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বারবার এসে পড়েছেন। এমনি একটি ঘটনার কথা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে একদিন রাতে ফাঁকা ট্রামে যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন, “ভালো ভালো কবিতা লেখার ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে-আজকেই একটা প্রেমের কবিতা লিখছিলুম, হঠাৎ তারপর কি মনে হলো, ভাবলুম একবার রবীন্দ্রনাথের দু’চারটে এই ধরনের কবিতা উল্টে দেখি তো-দেখলুম, না সেগুলোর কতক ভাবধারা আমার রচনার ভেতর অজান্তে চলে এসেছে। আমি ফেলে দিলুম। এখন বুঝছি ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি যতদিন মাথার ওপর থাকবেন, ততদিন আমরা ওঁকে ডিঙাতে পারবনা-অতএব আপাততঃ চূপচাপ থাকবার মতলব করে রেখেছি।” (কাজী নজরুল প্রসঙ্গে, কথাসাহিত্য জ্যেষ্ঠ ১৩৭৭)

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

ভক্তির আতিশয্য নজরুলের ভক্তরা তাঁকে মাঝে মাঝে বলতেন তাঁর মত কবিতা রবীন্দ্রনাথও লিখতে পারেন না। তাঁর মুসলিম ভক্তরা তাঁকে ‘মুসলিম বঙ্গের রবি’ বলতেন যদিও এই কথাটা তিনি তাঁর নিজের প্রথম বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করেছিলেন সেটি তাঁর কম বয়সের চপলতা বলে মার্জনা করা গেলেও পরে তাঁর ভক্তরা তাঁকে ঐ অভিধায় সম্বোধন করতে ভালবাসতেন। পরে যখন রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বব্যাপী বিস্তারকে গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন তখন এই সব অভিধায় বিরক্ত হতেন, লজ্জিত হতেন, রাগ করতেন। তিনি যখন নীরব হয়ে গেলেন তখন ভক্তরা আজও বলতে থাকেন রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়ে গেছে নজরুলের যুগ শুরু হয়েছে। এখন বাঙালী পুস্তকও আছেন তাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই, তিনি পুরোনো হয়ে গেছেন, বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব নেই, জীবনানন্দই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে গেছেন। তিনি সুস্থ থাকলে এসব মন্তব্য সম্পর্কে কী বলতেন জানি না, হয়ত বলতেন ঈশ্বর এই অর্বাচীনদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ‘সওগাত’ পত্রিকার গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের সব গ্রন্থ ছিলনা- নজরুল উদ্যোগী হয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থ কেনা করিয়েছিলেন।

নজরুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়েছেন আবেগপ্রবণ কবিদের ঐ রকমই হয়ে থাকে বিন্দু রবীন্দ্রনাথ আজীবন নজরুলকে স্নেহ করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ‘গোরা’ উপন্যাসের চলচিত্রায়নের সময় নরেশচন্দ্রমিত্র (১৮৮৮-১৯৬৮) সঙ্গীত পরিচালকরূপে নজরুলকে নির্বাচিত করেন তখন সুরকাররূপে নজরুলের জনপ্রিয়তা সবার উপরে। ‘গোরা’ চলচিত্রে গান ছিল মোট ৭টি প্রতিদিন হার এসে ফিরে যায় ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পাম উৎসব রাত, ‘রোদনভরা এ বসন্ত’ ৩টি গান ছিল রবীন্দ্রনাথের, ১টি ছিল সংস্কৃত শ্লোক, ১টি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ এর অংশ বিশেষ আর ১টি ছিল নজরুলের ‘উষা এল চুপি চুপি সলাজ নিলাজ অনুরাগে’। বিনয় (মোহন ঘোষাল) ও ললিতা (প্রতিমা দাশগুপ্ত) রাতে স্টিমারের কেবিনে। ললিতা কেবিনের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে- হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে যেতে কেবিনের বাইরে এসে দেখে বিনয় চেয়ারে ঘুমিয়ে আছে। ভোরের আলো সবেমাত্র দেখা দিয়েছে। এরকম পরিবেশে উষা এলো চুপি চুপি গানটি ভেসে আসে। গানটি গেয়েছিলেন ভক্তিময় দাশগুপ্ত। রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিচালকরূপে নজরুলের নাম দেখে সেদিন কথা উঠেছিল যেমন ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ভক্তরা সরব হয়েছিলেন। ছায়াচিত্রটি তখন মুক্তি লাভের প্রতীক্ষা করছে তখন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে আপত্তি আসে। বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে ছবিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে এবং গানের সুর যথাযথ নয় কাজেই ছবিটি মুক্তি লাভ করতে পারে না। শান্তিনিকেতন তৎকালীন সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তিনি তাঁর আত্মজীবনী ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’-এ উল্লেখ করেছেন যে ‘রোদনভরা বসন্ত’ রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর যথাযথ হয়নি। ছবির প্রযোজক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। নজরুল এতটা ভাবতে পারেননি তিনি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আপত্তি হবে না- মিউজিক বোর্ড যে আপত্তি তুলবে তা তিনি কল্পনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত বোর্ডের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না আর সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নজরুলের বিষয়টাও তিনি জানতেন না। নজরুল সঙ্গে সঙ্গে ট্যান্সি করে ফিল্মের প্রিন্ট ও প্রোজেক্টর নিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। নিতাই

ছায়া

৫

৫

সাহিত্যিকী

বাটক: এই সম্পর্কে বলেছেন, “বিশ্বকবি তো তাঁকে দেখে অন্যাক ও পরমুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বললেন এসেজই যখন কয়েকদিন আমার কাছে থেকে যাও। নজরুল বললেন, ‘সে তো আমার সৌভাগ্য-কিন্তু এখন যে এক ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।’ তারপর তিনি ছবি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে বললেন। বিশ্বভারতী বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়ার কথাও জানালেন। শুনে বিশ্বকবি বেশ অসন্তুষ্ট স্বরে অভিমত প্রকাশ করলেন- ‘কী কাজ বলত? তুমি শিখিয়েছ আমার গান আর ওরা কেন আক্কেলে তার দোষ ধরে? তোমার চেয়েও আমার গান কী তারা বেশী বুঝবে; আমার গানের মর্যাদা কী ওরা বেশি দিতে পারবে?’ নজরুল বললেন, ‘বিস্ত্র লিখিত অনুমতি না পেলে সামনের ঘোষিত তারিখে ছবিটার মুক্তি দেওয়া যাবে না। আপনি দয়া করে আজ এক সময় ছবিটা দেখুন-আমি প্রজেক্টর ও ফিল্ম সঙ্গে করে এনেছি। তারপর অনুমতি পত্র একটি সই দিয়ে দিন’। বিশ্বকবি বললেন, ‘ছবি দেখাতে চাও সকলকেই দেখাও-সবাই আনন্দ পাবে। আপাততঃ দাও বিসেস সই করতে হবে’-এই বলে কবির হাত থেকে আগের থেকে লিখে রাখা অনুমতি পত্র নিয়ে তাতে সই ও তারিখ দিয়ে দিলেন।” (মুক্তবিহঙ্গ-স্বর্ণপক্ষ ঈগল, কাফেলা আশ্বিন ১৩৮৯: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮২ পৃ ৩৭) ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’-এ শৈলরঞ্জন মজুমদার এই দিনের ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, “আমি আমার মন্তব্য লিখেছিলাম There are some matrial defects.... পাবলিসিং ডিপার্টমেন্ট থেকে কিশোরী সাতরা আসার মন্তব্য পড়ে। গানগুলি অনুমোদন করতে রাজী হননি। অথচ এদিকে ফিল্ম দেখাবার দিন আসন্ন। এই অবস্থায় নরেশ মিত্র, সত্যসেন ও কাজী নজরুল ইসলাম এই তিনজন এসে গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে বললেন-আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। শুনেছি গুরুদেব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন এবং টেলিফোন করে পাবলিসিং হাউস থেকে আমার মন্তব্যের কাগজটি আনিয়ে নিয়েছিলেন। সেটা পড়ে পাশে রেখে নিজে আলাদা করে ‘অনুমোদন’ লিখে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন।” ‘গোরা’ ফিল্মের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে রিলিজ হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুলাই কলকাতার ‘চিত্রা’ সিনেমায়।

সামগ্রিক ১৯৩৫ সালে নজরুল কলকাতার ‘নাগরিক’ ‘নাটক’ পত্রিকার পূজো সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। নজরুল তখন পুরোপুরি গ্রামোফোন কোম্পানী, চলচিত্র ও রঙ্গমঞ্চ নিয়ে মেতে আছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের চিঠিপত্রের আদানপ্রদান কতবার হয়েছে তার কোন হদিশ মেলে নি। এই একটি মাত্র চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লেখা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত জবাব পাওয়া গেছে। নজরুল লিখিত চিঠিটি নীচে দেওয়া হল।

NAGARIK
Illustrated Bengali weekly

I/C Manmatha Prhattachagga shat
Calcutta 24.8.1935

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

শ্রীচরণাবিন্দেয়,

গুরুদেব! বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি। আমার ওপর হয়ত প্রসন্ন কাব্যলক্ষ্মী হিজ মাষ্টার্স কুবুজের ডয়ে আমায় তাগ করেছেন বহুদিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় খেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি। আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সন্তোষে দূবেদুরেই থেকেছি। তবু ছানি আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধু “নাগরিক” পরিচালনা করছেন। গতবার পূজায় আপনার বিরণ-স্পর্শে নাগরিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল, এবারও আমরা সেই সাহসে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি। আপনার যে কোনো লেখা পেলেই ধন্য হব। ভাদ্রের শেষেই পূজা-সংখ্যা নাগরিক” প্রকাশিত হবে, তার আগেই আপনার লেখনী প্রসাদ আমরা পাব, আশা করি।

আপনার স্বাস্থ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করলাম না/ইতি

প্রণত-

নজরুল ইসলাম

চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন তার পরতে পরতে ঝরে পড়ছে স্নেহ-

কন্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে তোমার সাড়া পেয়ে মন খুব খুশী হলো কিছু দাবি করেছি-তোমার দাবি অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুশাবিক এই, পঁচাত্তরে পড়তে তোমার অনেক দেরি আছে, সেইজন্য আমার শীর্ণশক্তি ও জীর্ণদেহের পরে তোমার দরদ নেই। কোনো মন্তব্যে বয়স বদল করতে পারলে তোমার শিক্ষা হতো। কিন্তু মহাভারতের যুগ অনেক আগে চলে গেছে, এখন দেহ-মনে মানব-সমাজকে চলতে হয় সায়েন্সের সীমানা বাঁচিয়ে।

অনেকদিন থেকে আমার আয়ুর ক্ষেত্রে ব্রহ্মস্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, কিছুদিন থেকে তার উপরও দেহযন্ত্রের বিকলতা দেখা গিয়েছে। এখন মূলধন ভেঙ্গে দেহযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে তা আর পূরণ হবার উপায় নেই। তোমাদের বয়স লেখা সম্বন্ধে প্রায় দাতাৰণ ছিন্দুম, ছোট বড় সকলকে অন্ততঃ মুছিভিক্ষার দিয়েছি। কলম এখন কৃপণ, স্বভাবদোষে নয়, অভাববশত। ছোট বড় নানা আয়তনের কাগজের পত্র-পুট নিয়ে নানা প্রার্থী আমার অঙ্গনে এসে ভিড় করে, প্রায় সকলকে ফেরাতে হলো। আসার অনাবৃষ্টির কুয়ের শেষতলায় অল্প যেটুকু জল জমেছিল, সেটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কৃপণের অখ্যাতি শেষ বয়সে স্বীকার করে নিয়ে রিক্ত দান পত্র হাতে বিদায় নেব। যারা ফিরে যাবে, তারা দুয়ো দিয়ে যাবে কিন্তু বিতরণীর মান্য হয়ে যায় সেন্সনি উঠবে না।

আজকাল দেখতে গাই ছোট ছোট কিত্তর কাগজের উদগম হচ্ছে। ফুল-ফসলের চেয়ে তাদের কাঁটার প্রাধান্যই বেশি। আমি সেবালের লোক, বয়সও হয়েছে। সাহিত্যে পরস্পর খোঁচাখুঁচির প্রাদুর্ভাব কেবল দুঃখকর নয়, আমার কাছে লজ্জাজনক বোধ হয়। এই জন্যে এখানকার ক্ষণসাহিত্যের কাঁচা রাস্তায় যেখানে সেখানে পা বাড়াতে আমার ভয় লাগে। সাবধানে বাছাই করে চলবার সময় নেই, নজরও স্ক্রীণ হয়েছে; এইজন্য এইসব গলিপথ এড়িয়ে চলাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তুমি ভরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক, করুণা দাবি করতে পারে। অকিঞ্চনের কাছে প্রার্থনা করে তাকে লজ্জা দিও না। এই নতুন, যুগে যে সব যাত্রী সাহিত্য তীর্থে যাত্রা করবে, পাথের তাদের নিজের ভিতর থেকেই সঞ্চার করতে হবে।

সাহিত্যিকী

তুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়। কখনও যদি ঐ
সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো খুশি হব। স্বচক্ষে আমরা অবস্থা দেখে যেতে
পারবে। ইতি

স্নেহরত

২৫ই তাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠির উত্তরস্বরূপ ‘তীর্থপাথিক’ নামক কবিতা লিখে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে
পাঠিয়েছিলেন। কবিতার শেষ স্তবকে আছে-

: তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,-
তব গুণ গানে ভাষা সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মুক বাণী।
কাব্যশ্রোকের বাণী বিভানের আমি কেহ নহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে ভবু কেন এ আশিষ হার?
প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্ম এ ধরনীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করতে তোমার কাব্য গীতে।।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল তাঁর ওপর চারটি কবিতা লিখেছিলেন-
‘অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি’, ‘কিশোর রবি’, ‘বি জন্মতিথি’, ‘তীর্থপাথিক।’ ‘অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি’
কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের আশীতম জন্মদিনে কলকাতা বেতার কেন্দ্র আয়োজিত এক বিশেষ
অনুষ্ঠানে (১৯৪০ চই মে সন্ধ্যা ছ’টা) নজরুল পাঠ করেছিলেন। তিনি ছাড়া ঐ অনুষ্ঠানে
কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়,
নরেন্দ্রদেব, রাধারাণী দেবী, রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন।
‘কিশোর রবি’ কবিতাটি ১৯৪১ ২৮শে মে এম্পারায় রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন কিশোর সংগঠনের
উদ্যোগে আয়োজিত ‘কিশোরবঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তী’ অনুষ্ঠানে পড়েছিলেন। তিনি ছাড়া
সুনির্মল বসুও (১৯০২-১৯৫৭) স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব
করেন ডঃ কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬)। ‘কিশোর রবি’ কবিতাটি দৈনিক
আনন্দবাজারের মৌমাছি (বিমলকুমার ঘোষ ১৯১০-১৯৮২) পরিচালিত ‘আনন্দমেলা’
বিভাগে প্রকাশিত হয় (১৯৪১, ২রা জুন সোমবার)। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ‘রবিহারা’ ও
‘সালাম অন্তরবি’ নামে দুটি কবিতা এবং কিশোরদের জন্য লিখিত ‘মৃত্যুহীন রবীন্দ্র
কবিতা’ রচনা করেন। প্রথম দুটি কবিতা কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল;
‘রবিহারা’ কবিতা ‘সংগাত’ ভাদ্র ১৩৪৮ ‘সালাম অন্তরবি’ মোহাম্মাদী ভাদ্র ১৩৪৮
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘রবিহারা’ কবিতাটি এইচ এমডি রেকর্ডে (N 27188) তিনি
আবৃত্তি করেছিলেন, রেকর্ডের উল্টোপিঠে ‘ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিরে’ গানটিতে
কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠও রয়েছে। তাঁর মহাপ্রয়াণে কলকাতা বেতার শোকযাত্রার
ধারাবিবরণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। জোড়াসাঁকো থেকে নিমতলা শ্যামানঘাট পর্যন্ত
শোকযাত্রার বিবরণ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও নজরুল ইসলাম দিয়েছিলেন। ধারাতাস্যের মাঝে
মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ব্যবস্থা ছিল, নজরুলও কবির প্রতি স্বরচিত কবিতা
পাঠ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। চিতায় অগ্নি সংযোগের সময় ‘ঘুমাইতে দাও শান্ত

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

রবিরে' গানটি তিনি গেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আরো ফিল্ম করপোরেশন রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার একটি তথ্যচিত্র তুলেছিলেন। 'মৃত্যুহীন রবীন্দ্র' কবিতাটি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৭৩) সম্পাদিত 'উত্তরা' মাসিক ও পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র প্রয়াণে একাধিক শোকসভায় তিনি যোগদান করেছেন। এরকম একটি শোকসভার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার ১৬ই আগস্ট ১৯৪১, ১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়-

সব্যসাচী কার্যালয়ে শোকসভা গত রবিবার পূর্বাঞ্চে 'সব্যসাচী' কার্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক শোকসভা হয়। কবি নজরুল ইসলাম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, কৃষ্ণচন্দ্র ভৌমিক, বীরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সাগরময় ঘোষ, শ্যামাপদ মিত্র, সৌরীন মজুমদার, উৎপল সেন প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রভক্ত হয়েও নজরুল নিজ কাব্যাদর্শে অবিচল ছিলেন। 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' নামক প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নচারী (Deamars) কবিদের দলে ফেলেছেন। এই প্রবন্ধটি ১৩৩৯ বার্ষিক 'প্রতিকা' পত্রিকায় বেরিয়েছিল পরে ১৩৪০ পৌষ-চৈত্রের 'বুলবুল' পত্রিকায় পুনরায় পত্রস্থ হয়! রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে সর্বত্রগামী হয়নি তা নজরুল মানতেন বলেই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় বলেছেন রবির কিরণ পশলনা মা অনুকারার বন্ধ ঘরে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসম্পূর্ণতার কথা মেনে নিয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথকে 'স্বপ্নচারী' কবিদের দলে ফেলে দেওয়া পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন কিন্তু বাস্তববর্জিত ছিল না, সারাজীবন তিনি শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন-তাঁর সাহিত্য খোলা লোকদের জন্য সবটা তৈরি হয়নি-মননকে কিছুটা সমৃদ্ধ করে তাঁর সাহিত্যে প্রবেশ করতে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এক অশান্ত বাধাবন্ধনহীন জীবনের স্বপ্ন ছিল। সেই ১৩১৯ (১৯১২) সালে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ তাঁকে ব্লাস্ত করেছে তখন তিনি সেই উদ্দাম, জীবনের গতিবেগ তাঁকে আন্দোলিত করেছে। 'জীবন স্মৃতি'-র 'কড়ি ও কোমল' অধ্যায়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি তাঁর বীতরাগ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, "দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিত মন্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল-আমার মন কোনো মতেই তাহাতে সায় দিতনা। আপনার সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুদ্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।" যে আকাজ্জা তাঁকে সারাজীবন তাড়িত করেছে তার সাকাররূপ নজরুলের মধ্যে হয়ত তিনি পেয়েছিলেন বলে নজরুলকে তিনি এত স্নেহ করেছেন যিনি বলেছিলেন 'আমি বেদুইন, আমি আপনাকে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।' আত্মমর্যাদা বোধের এমন স্পর্ধিত উক্তি সে-সময় নজরুল ছাড়া আর কে-ই বলতে পারতেন!

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ রায় ও রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে অনেক সূত্রের সমাধান পেয়েছি]

